?????????? ???????? ??? ?????

আমার মাধ্যমিক শিক্ষা জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর নাম ছিল মনিরা। মাধ্যমিক শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর সে ভালো কলেজে ভর্তির সুযোগ পেলেও আমি সুযোগ পাইনি। ইচ্ছে ছিল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা জীবনটাও একই সাথে পারি দিতে। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই কঠিন। এটা মেনে নিতেই হবে। তাই পরবর্তীতে অন্য একটা কলেজে ভর্তি হলাম। কলেজ ভিন্ন হলেও বন্ধুত্বর সম্পর্কে কখনো দূরত্ব বাড়েনি। প্রায়শই ফোনে কথা হতো।

এভাবে চলতে থাকল দিন-কাল। এক পর্যায়ে আমি বায়োলজি নিয়ে অনার্স পাস করলাম। হয়তো, আমার কপালে এতটুকুই লেখাপড়া ছিল। কেননা, আমার পরিবার পার্শ্ববর্তী এলাকার ভালো একটা চাকরীজীবী ছেলের সাথে বিয়ে ঠিক করে রেখেছিল। কি আর করার? মেয়েদের বেশি লেখাপড়া করতে নেই। বি.এস.সি অনার্স পাস করেছি, এটাই-বা কম কি! আপরদিকে আমার বান্ধবী মনিরা মেডিক্যাল ভার্সিটিতে এডমিনশন শিফট নিয়েছিল। তারও কোর্স প্রায় কমপ্লিট।

আমার বিয়ের প্রায় দেড় বছর পর, অর্থাৎ আমার কোলে যখন আমাদের প্রথম সন্তান, তখন শুনলাম মনিরা ভালো একটা প্রাইভেট মেডিক্যালে সহকারী হিসেবে জয়েন্ট করেছে। খবরটা শুনে দারুণ আনন্দ লাগছিল। তার এতদিনের তীলে-তীলে পুষে রাখা স্বপ্নটা আজকে বাস্তবায়িত হয়েছে। এটা তো মহানন্দের ব্যাপার! আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী মেডিক্যালের সহকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী! এটা তো গর্বের বিষয়। কিন্তু আমরা তখন ঢাকায় ছিলাম। এই আনন্দের সময়ও আমাকে তার কাছে না পেয়ে বেচারী খুব রেগে ছিল। ফোনে বারবার বলছিল,- ‘ধুর, তোকে ছাড়া অনুষ্ঠানের আনন্দগুলো পরিপূর্ণ রূপ পায় না। কেমন যেন শূন্য শূন্য লাগে। তুই কবে আসবি? তুই বাড়িতে আসবি না? দুলাভাই ও বাবুকে নিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের বাড়িতে আসবি। নইলে আমি প্রচণ্ড রাগ করব কিন্তু! তুই পারিসও বটে রে আমার মতো পাগলী বোনটাকে ভুলে থাকতে।”এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বললি? আমার তো মনে হচ্ছে, তুই যদি ডাক্তারনি না হয়ে স্কুলের মাস্টারনি হতি, তাহলে অনেক ভালো হতো। অন্তপক্ষে জাতির মেরুদণ্ড সোজা করে দিতে পারতি।’ ‘বাহ, তুইও কি আমার থেকে কম লেকচার দিলি নাকি? আর স্কুলে পড়া অবস্থায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বক্তৃতায় বক্তব্য দিয়ে মঞ্চ কাঁপাইছিলি! মনে আছে তো?’ ‘হিহিহি, দেখতে হবে না বান্ধবীটা কার? যে যেমন প্রকৃতির লোক, সে অনুরূপ লোকের সাথেই বন্ধুত্ব করে।’

‘হু, এবার বল- আসবি কবে?’ ‘বলতে পারলাম না রে। তোর দুলাভাই আগে আসুক আফিস থেকে। আমাদের অফিস তো আজকেই বন্ধ দিল। সম্ভবত, তাদের অফিস কাল-পরশই বন্ধ দিবে। হয়তো, দুই-তিন দিনের মধ্যেই গ্রামে চলে আসব।’ ‘তাহলে কথা কিন্তু ওই- বাস থেকে নেমেই আমাকে ফোন দিবি। গত দুই বছর থেকে তোর কোনো খোঁজ-পাত্তা নাই। স্বামীর প্রেমে লাইলী হয়ে গিয়েছিস! এবারের ঈদের ছুটিতে তোকে আর ছাড়ছি না, হুঁ ‘ধুর, ছাড় না রে বোন। আর কত ক্রিটিসাইজ

করবি? তুই কি কখনো তোর স্বামীর প্রেমে লাইলী হবি না?' 'নাহ্, হিহিহি। বাই দ্যা ওয়ে! টেক কেয়ার এন্ড উইশ ইউ গুড হেলথ।' 'বাই অবশেষে দু'দিন পর আমরা বাসে করে ঢাকা থেকে রংপুর যাত্রা শুরু করলাম। দীর্ঘ প্রতিক্ষা ও ক্লান্তির পর প্রায় সকাল ৯টায় রংপুর বাস টার্মিনালে নামলাম। এদিকে দেখি আমার পিচ্চি ভাই তামিম ও প্রিয় বান্ধবী মনিরা এক সাথে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাদেরকে ডাকতে লাগলাম। সম্ভবত, তারা আমাদেরকে এখনো দেখেনি। তামিম আমাকে দেখে মনিরাকে বলতে লাগল-, 'মনিরা আপু, ঐ যে বুবু এসেছে।'

ব্যস, তারা দুজন দ্রুত এসেই চিলের মতো ছো মেরে আমার কোল থেকে তাহসিন বাবুকে নিয়ে গেলো। আর আমার বাবুও যেন কি! মনিরার কোলে যেয়েই খুশিতে ভুষি। আচমকা আমার মুখ ফসকে বের হয়ে গেলো-, 'বাহ, যেমন বাবা তেমন তার ছেলে। একদম এদিকে আমার বাচ্চার বাবা রেগে-মেগে অগ্নিশর্মা,- 'হ্যোয়াট? আমি আবার কি করলাম?' 'স্যরি মহাশয়! আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন? ভেবেছেন কি, তোমার ছেলে তার কোলে যাওয়া মানে- আজকে আর বাড়িতে যাওয়া হলো না। এখন চলো তাদের বাড়িতে।'

'কিহ্! ইহ্ আল্লাহ্, এ কোন মছিবত! শরীরটা বড্ড ক্লান্ত, তোরা কি শুরু করলি এ মুহূর্তে? ওদিকে মনিরা ও তামিম আমার বাবুকে নিয়ে সি.এন.জিতে চড়ে বসে আছে। আর বলতেছে,- 'মরিয়ম, তুই আসবি কি-না বল? নইলে তোর বাচ্চাকে নিয়ে গেলাম 'এই না না, প্লিজ প্লিজ!' 'তাহলে আসো।' আমার বাচ্চার বাবা তাকে বলতে লাগল,- 'দেখ মনিরা, আমরা বরং কালকে তোমাদের বাসায় আসব। প্লিজ, আজকে যেতে দে। আমরা আজকে খুব ক্লান্ত রে বোন।' 'আচ্ছা ভাইয়া। বাই-বাই 'এই এই, থামো থামো!'কে শোনে কার কথা! সিএনজি বেটাও দিলো জোরে টান। ধেৎ, তামিমটাও ওর সাথেই চলে গেলো। সব ক'টাই বদের হাড্ডি। মনে মনে মনিরার উপর রাগও হচ্ছে, আবার হাসিও পাচ্ছে। আর এদিকে আমার স্বামী বেচারা ভয়ে কাচু-মুচু হয়ে আছে। না জানি আমার রাগের প্রভাব তার উপর পড়ে! আমি তাকে বলতে লাগলাম,- 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে জাবর না কেটে বাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করো শীঘ্রই।'

'কি, আমি গরু নাকি? তাই জন্যে জাবর কাটব?' 'না, তুমি গরু হতে যাবে কেন? তাদের বাসায় গেলে কি এমন অশুদ্ধ হতো!' 'একটু বোঝার চেষ্টা করো, বাড়িতে আম্মা আমাদের জন্য অপেক্ষা করতেছে। তুমি আমাদের বাচ্চাকে ছাড়া দুই মিনিটও থাকতে পারছ না, তাহলে তারা দুই বছর কিভাবে কাটিয়েছে? প্লিজ, রাগ করো না।' 'আহা রে যুক্তি! যাও তাহলে, যাও। বাচ্চাকে ছাড়া খালি হাতে বাড়িতে যাও, আর ফ্রিতে তাদের বকা খাও। একটা কথা মনে রাখো- তারা এখন আমাদের জন্য নয়, তাদের নাতীকে দেখার জন্যই অপেক্ষা করতেছে। দেখিও কি জবাবদিহিতা করে তোমাকে।' 'ওহ মাই গড! এখন তাহলে কি হবে? প্লিজ মরিয়ম, তুমি কিছু একটা উপায় বের করো।' 'হয়েছে, আন্দাজি টেনশন! আমরা বলব, আমরা তাদের সাথে যাইনি জন্যে মনিরা ও তামিম একত্রে ষড়যন্ত্র করে আমাদের থেকে জোর করে বাবুকে নিয়ে গিয়েছে।' 'হ, তাদেরকে তুমি বুঝাইবা। আমি কিছু জানি না।' 'তুমি কিছু জানো না মানে?' 'ওহ্ মরি, ঝগড়া বাদ দিয়ে চলো তো।' 'আচ্ছা চলো।'

অতঃপর আমরা গ্রামের বাড়িতে আসলাম। শাশুমা ও শ্বশুর আব্বাকে বুঝিয়ে বললে তাদের নাতী সম্পর্কে তেমন জবাবদিহিতা করতে হয়নি। তবুও বাবুকে ছাড়া ভালো লাগছে না কিছু। তানিয়াকে ফোন দিলাম,- 'কি রে, পৌঁছেছিস তোরা?' 'হু…' 'তাহসিনকে ফোনটা দে তো।' 'ওয়েট এন্ড গিভিং হিম…' 'ঠিক আছে, ওকে দে ফোনটা।' 'হ্যালো মরিয়ম!' 'হ্যাঁ, বল।' 'উহু, তোর ছেলে তোর সাথে কথা বলবে না। টিভিতে কার্টুন দেখতেছে আর বলতেছে, আম্মু পঁচা!' 'কিহ্? আমি পঁচা!' 'ধুর, ছাড় না এসব। তোর বাচ্চাটা কিন্তু খুব শান্ত-শিষ্ট রে!' 'হ, তাকে লাই দিয়ে মাথায় তুলো। তার পর বুঝবা।' 'আচ্ছা, রাখালাম তাহলে।' 'আমরা কালকে যাবো কিন্তু!' 'হাহাহা, তোরা না আসলেও চলবে।' 'ফাঁদ তৈরি করে রেখেছিস। যাওয়া ছাড়া বিকল্প বুদ্ধি নাই।' 'হাহাহা, এখন বুঝো মজা।' 'ধুর!'

পরের দিন বিকালে তাদের বাসায় রওয়ানা দিলাম। সেখানে অনেক হাসি, আনন্দ, ভালোবাসা ও উচ্ছ্বাস প্রবণের সাথে পার করলাম সময়গুলো। সেই আন্দময় মুহূর্তগুলো আজো স্মৃতির পাতায় অলিখিত কাব্যে রচিত হয়ে আছে। কিন্তু যাকে নিয়ে এই কাব্য রচিত, সেই মানুষটি আজ পৃথিবীতে নেই। কথা ছিল ঈদের পরই তার বিয়ে হবে। তার প্রিয় বান্ধবী মরিয়মকে নিয়ে আনন্দের মুহূর্তগুলো উপভোগ করবে। ডাক্তারনী হয়েছে, মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিন করে দিবে। কিন্তু স্বপ্নগুলো অপূর্ণই রয়ে গেলো।

দিনটি ছিল সোমবার। বিয়ের শপিং করার জন্য তার বড় ভাই ও কাজিনরাসহ মার্কেটে যাচ্ছিল। বিয়ের শপিং সবার জন্য আনন্দের বন্যা বয়ে আনে। অনুরূপ তাদের মাঝেও এই আনন্দটা কম নয়। কিন্তু হঠাৎ তাদের সাথে ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত রোড এক্সিডেন্ট মুহূর্তের মধ্যে সব আনন্দগুলোকে ধুলিসাৎ করে দিল। তার চাচাতো বোন ফারজানা গুরুত্বর আহত হলেও মনিরাকে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই ইন্তেকাল করেন। একটি ফুল পূর্ণ বিকশিত হবার আগেই ঝড়ে পড়ল। মনিরার স্বপ্নের নীল আকাশটাকে মুহূর্তের মধ্যে দুঃস্বপ্নের কালো মেঘ এসে ঢেকে দিল। মানুষ জন্মেছে মরার জন্যই। কিন্তু এই আকস্মিক মৃত্যুকে মেনে নেয়া খুবই কষ্টকর। চরম ঘৃণা করি রোড এক্সিডেন্টকে! ধীক তোমাকে!

আজ তিন তিনটি বছর পার হয়ে গেলো। নাহ, ভুলতে পারিনি আমার বান্ধবী মনিরাকে। আমার মনে হচ্ছে না যে, সে মরেছে। তার স্মৃতিগুলো এখনো জ্যান্ত। এখনো তার স্মৃতিগুলোকে নিয়ে নীরবে চোখের অশ্রু ঝড়াই। মাঝে মধ্যে আমার সেই পিচ্চি অবুঝ ছেলেটা চোখের জল মুছে দেয় আর বলে,- 'আম্মু, তুমি এত কাঁদো কেন? আব্বু কি তোমাকে খুব মেরেছে?' নাহ, ছেলেটাকে উত্তর দিতে পারি না। শুধু তাকে জড়িয়ে ধরে বলি,- 'ধুর, তোর আব্বু খুবি-ই ভালো মানুষ।